HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – বাংলাদেশে সরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

টপিক – ০১ বাংলাদেশে সরকারি সমাজসেবার পরিচিতি

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: বাংলাদেশে সরকারি সমাজসেবার পরিচিতি
টপিক ০২: গ্রামীণ সমাজসেবা
টপিক ০৩: পল্লী মাতৃকেন্দ্র
টপিক ০৪: শহর সমাজসেবা কর্মসূচী
টপিক ০৫: কিশোর কিশোরী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান
টপিক ০৬: বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন ও কার্যক্রম
টপিক ০৭: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
টপিক ০৮: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ০৯: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: বাংলাদেশে সরকারি সমাজসেবার পরিচিতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশে সরকারি সমাজসেবার পরিচিতি

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গৃহীত, বাস্তবায়িত ও নিয়ন্ত্রিত সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমকে সরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম বলা হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিকল্প কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে জনকল্যাণকে গ্রহণ করা হয়েছে। নাগরিকদের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ, সুপ্ত ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ, নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিধান আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হিসেবে বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃত। বিশ্বের সকল কল্যাণমুখী রাষ্ট্রই সুনির্দিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনার আওতায় নাগরিকদের কল্যাণে বহুমুখী সমাজ উন্নয়ন এবং সমাজসেবা কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশে পৃথক মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের আওতায় সমাজ উন্নয়ন ও সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশে সরকারি সমাজসেবার পরিচিতি

ব্রিটিশ শাসিত বাংলাদেশে ১৯৪৩ সালে সরকারি পর্যায়ে চারটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের সূচনা হয়। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামক দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়। বাংলাদেশ পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত হয়; যার নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। ভারত বিভক্তির পর ভারত হতে আগত মোহাজেরগণ রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে অভিবাসন গড়ে তুলে। এর ফলে শহর সমাজে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা দেখা দেয়। এ সমস্যা মোকাবেলার জন্য ১৯৫৫ সালে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী ঢাকা আরবান কমিউনিটি ডেভেলপম্যান্ট বোর্ড (Dhaka Urban Community Development Board) গঠন করা হয়।

বোর্ডের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার জাতিসংঘের সহযোগিতায় ঢাকার কায়েতটুলীতে ১৯৫৫ সালে পরীক্ষামূলকভাবে শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (Urban Community Development Project) গ্রহণ করেন। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে আধুনিক ও পেশাদার সমাজকল্যাণের বাস্তব অনুশীলন শুরু হয়। ১৯৫৬ সালে স্বেচ্ছাসেবী সমাজসেবা কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের জন্য জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠন করা হয়। এ পরিষদ ১৯৫৭ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে হাসপাতাল সমাজসেবা প্রবর্তন করে।

বাংলাদেশে সরকারি সমাজসেবার পরিচিতি

১৯৬১ সালে ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে স্থানান্তরিত ভবঘুরে কল্যাণ কেন্দ্র; শিক্ষা পরিদপ্তর থেকে হস্তান্তরিত সরকারি এতিমখানা এবং সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে হস্তান্তরিত হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে পৃথক প্রশাসনিক কাঠামো সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর গঠন করা হয়।

১৯৬১ সালে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করে সরকারি সমাজসেবা কার্যক্রমের সার্বিক প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব উক্ত পরিদপ্তরের উপর দেয়া হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর ১৯৭৮ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগ হিসেবে উন্নীত হয়ে স্থায়ী জাতিগঠনমূলক বিভাগের মর্যাদা লাভ করে। তৎকালীন পাকিস্তান আমল থেকে সরকারি সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মীদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য জাতীয় সমাজসেবা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বাংলাদেশ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যাবলী সমাধানের লক্ষ্যে সরকারি সমাজসেবা কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৪ সালে গ্রামীণ সমাজসেবা (RSS) গ্রহণের মধ্য দিয়ে সরকারি সমাজকল্যাণ কার্যক্রম গ্রাম পর্যায়ে বিস্তার লাভ করে; যা আগে শহর এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

বাংলাদেশে সরকারি সমাজসেবার পরিচিতি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ের পরিচিত

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পৃথক ও স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করার পূর্বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথ মন্ত্রণালয় হিসেবে সংযুক্ত ছিল। তৎকালীন পাকিস্তান আমলে এ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং শ্রম, জনশক্তি ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে এ মন্ত্রণালয় সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এ পরিচিতি ১৯৮৯ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত বহাল ছিল। একই বছরের নভেম্বর মাসে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নামে পৃথক দু'টি মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি হয়।

বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তর দেশের সামগ্রিক সরকারি বেসরকারি সমাজকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে সরকারি সমাজসেবার পরিচিতি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ের পরিচিত

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহ হলো-

সমাজসেবা অধিদপ্তর;

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ;

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন;

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য

মানব সম্পদ উন্নয়ন;

দারিদ্র্য হ্রাসকরণ;

সমাজের অনগ্রসর ও দুর্বল অংশের কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন;

সামাজিক সমস্যা মোকাবেলাকরণ;

ব্যক্তির সর্বোচ্চ বিকাশে সহায়তা দান।

বাংলাদেশে সরকারি সমাজসেবার পরিচিতি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ের পরিচিত

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নীতি বাস্তবায়নের কৌশলগুলো হলো-

লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর অংশায়নের মাধ্যমে কর্মসূচির বাস্তবায়ন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় লক্ষ্যভুক্ত দলের মতামতের প্রতি গুরুত্বারোপ।

ব্যক্তি ও পরিবারের মর্যাদার প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (Input) সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

ফলাবর্তন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য অনুভূত চাহিদার (Feed back result) মূল্যায়ন।

নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য অনুভূত চাহিদার (Felt needs) প্রতি গুরুত্বারোপ।

অবহেলিত, দুঃস্থ, উপেক্ষিত, সমস্যাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের অবহেলিত, উপেক্ষিত, দারিদ্র্যপীড়িত এবং সামজিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যায় নিপতিত মানুষের চাহিদা এবং এ জনগোষ্ঠীকে সর্বোচ্চ মানবিক মর্যাদা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, জাতীয় ভাবধারার সাথে সম্পৃক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ চিন্তা-চেতনায় ব্রতী হয়ে ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশে সরকারি সমাজসেবার পরিচিতি

বাংলাদেশ সমজাসেবা অধিদপ্তরের পরিচিতি

সমাজসেবা অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকারের অন্যতম বৃহত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ অধিদপ্তর। এটি দেশের দরিদ্র, অবহেলিত এবং পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সার্বিক কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত। সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত বহুমুখী কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো লক্ষ্যভুক্ত (Target group) পশ্চাদপদ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বহুমুখী কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজ সচেতন, স্বাবলম্বী এবং উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। যাতে তারা আর্থ-সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে অবদান রাখতে সক্ষম হয়। সমাজসেবা অধিদপ্তর দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী সরকারি পরিকল্পনা মোতাবেক বিভিন্ন কর্মসূচির উন্নয়ন, প্রসারণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে।

বাংলাদেশে সরকারি সমাজসেবার পরিচিতি

বাংলাদেশ সমজাসেবা অধিদপ্তরের পরিচিতি

তৎকালীন পাকিস্তান আমলে ১৯৫৬ সালে স্বেচ্ছাসেবী সমাজসেবা কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের জন্য জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ (বর্তমান জাতীয় সমাজসেবা পরিষদ) গঠন করা হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের কার্যাবলি সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত উপায়ে পরিচালনার জন্য সরকারি পর্যায়ে তেমন কোন নীতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করা হয়নি। সরকারি নিয়ন্ত্রণের অভাবে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর কার্যক্রমে বিশৃংখলা দেখা, সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলোর কার্যাবলি সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য, "স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (রেজিস্ট্রেশন ও কন্ট্রোল) অর্ডিন্যান্স ১৯৬১ প্রণয়ন করেন। এ সময় সমাজকল্যাণ কার্যাবলি সুষ্ঠু ও সুশৃংখলভাবে পরিচালনার জন্য পৃথক সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এমতাবস্থায় ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে ভবঘুরে কল্যাণ কেন্দ্র, শিক্ষা পরিদপ্তর হতে সরকারি এতিমখানা এবং সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে হাসপাতাল সমাজসেবা স্থানান্তরিত করে এসব কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৯৬১ সালে পৃথক প্রশাসনিক কাঠামো হিসেবে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর গঠন করা হয়।

বাংলাদেশে সরকারি সমাজসেবার পরিচিতি

বাংলাদেশ সমজাসেবা অধিদপ্তরের পরিচিতি

সরকারি-বেসরকারি সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের সার্বিক প্রশাসনিক দায়িত্ব সদ্য প্রতিষ্ঠিত পরিদপ্তরের উপর দেওয়া হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৮ সালে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর, সমাজকল্যাণ বিভাগ হিসেবে স্থায়ী জাতি গঠনমূলক বিভাগের মর্যাদা লাভ করে। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশক্রমে সমাজকল্যাণ বিভাগের প্রশাসনিক কাঠামো প্রসারণ করে এর নাম সমাজসেবা অধিদপ্তর (Social Services Department) রাখা হয়।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের ভিশন

সমাজের অনগ্রসর, বঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান এবং ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

বাংলাদেশে সরকারি সমাজসেবার পরিচিতি

বাংলাদেশ সমজাসেবা অধিদপ্তরের পরিচিতি

সমাজসেবা অধিদপ্তরের মিশন

- ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের শতকরা ৫০ ভাগ অসহায় ও সমস্যগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান;
- সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের শতকরা ৫০ভাগ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন;
- এতিম, অবহেলিত, দুস্থ ও বিপন্ন শিশুদের অধিকার সুরক্ষা, প্রতিপালন, কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন;
- সামাজিক অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের সংশোধন, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন;
- অসহায়, দুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকতর সুরক্ষা, প্রতিপালন, কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন;
- সেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহকে নিবন্ধন প্রদান, তাদের কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান ও তত্ত্বাবধান;
- সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন;
- সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে সহায়তা প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ;

বাংলাদেশে সরকারি সমাজসেবার পরিচিতি

বাংলাদেশ সমজাসেবা অধিদপ্তরের পরিচিতি

সমাজসেবা অধিদপ্তরের সেবাগ্রহীতা

- অনগ্রসর, দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী;
- অসচ্ছল, অসহায় ও সমস্যাগস্ত প্রবীণ ব্যক্তি;
- মুক্তিযোদ্ধা;
- পিতৃহীন, পিতৃমাতৃহীন, অবহেলিত, দুস্থ, বিপদাপন্ন, পিতামাতার যত্নবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধী শিশু সামাজিক অপরাধপ্রবণ ব্যক্তি;
- আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু;
- অসহায়, দুঃস্থ, রোগী;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি;
- সামাজিক অনাচার ও পাচারের শিকার শিশু ও মহিলা;
- পেশাজীবী সমাজকর্মী;
- সেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা;
- সরকারি বেসরকারি সহযোগী সংস্থা।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – বাংলাদেশে সরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

টপিক – ০২ গ্রামীণ সমাজসেবা

টপিক ০২: গ্রামীণ সমাজসেবা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

গ্রামীণ সমাজসেবা

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা গ্রামীণ। গ্রামকে কেন্দ্র করে এদেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠেছে। জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭৬ ভাগের বেশি গ্রামে বাস করছে (২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)। তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে জাতিসংঘের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় শহর সমষ্টি উন্নয়নের মাধ্যমে আধুনিক সমাজকল্যাণের প্রয়োগ শুরু হলেও গ্রামীণ উন্নয়নে তা প্রয়োগের প্রচেষ্টা চালানো হয়নি। ১৯৭৪ সালের আগ পর্যন্ত শহর সমষ্টি উন্নয়ন ও চিকিৎসা সমাজকর্ম প্রকল্পের মধ্যেই সমাজকল্যাণ বিভাগের কার্যক্রম সীমিত ছিল। গ্রামীণ অগণিত দুঃস্থ, দরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষের কল্যাণে ১৯৭৪ সালের আগ পর্যন্ত সুর্নিদিষ্ট বা সার্বিক কোন কর্মসূচি ছিল না।

গ্রামীণ ছিন্নমূল অসহায় মানুষের দুর্দশা লাঘব ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে 'গ্রামীণ সমাজসেবা' (Rural Social Service-RSS) শিরোনামে পরীক্ষামূলক প্রকল্প গৃহীত হয়। প্রথম পর্যায়ে ১৯টি জেলার ১৯টি উপজেলায় গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্প পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। পরীক্ষামূলক প্রকল্পসমূহের প্রাথমিক সাফল্যের ভিত্তিতে পরবর্তীতে ৪০টি উপজেলায় সম্প্রসারিত করা হয়।

বর্তমানে জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি হিসেবে গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় দেশের সকল উপজেলায় রাজস্বখাতে সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে ৪৮১টি উপজেলায় সমাজসেবা কার্যালয় গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।'

গ্রামীণ সমাজসেবা

গ্রামীণ সমাজসেবার ধারণা

গ্রামীণ সমাজসেবা হলো সমষ্টি উন্নয়ন কেন্দ্রিক একটি বহুমুখী (Community based multidimentional development process) সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন প্রক্রিয়া। সামগ্রিক উন্নয়ন এ্যাপ্রোচের অংশ হিসেবে গ্রামীণ ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও অন্যান্য কৃষক এবং দরিদ্র পেশাজীবী শ্রেণীকে সংগঠিত করা এর প্রধান লক্ষ্য। গ্রামীণ জনগণের নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে গ্রামীণ সমস্যা সমাধানের সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া হলো গ্রামীণ সমাজসেবা। বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রকাশিত 'সোশ্যাল সার্ভিসেস ইন বাংলাদেশ' (Social Services in Bangladesh) গ্রন্থে বলা হয়েছে, "গ্রামীণ সমাজসেবা হচ্ছে বহুমুখী ও সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন প্রক্রিয়া। যার মাধ্যমে ভূমিহীন ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সংগঠন প্রতিভা, নেতৃত্ব প্রদান এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ক্ষমতার বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। যাতে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সব শ্রেণীর গ্রামীণ জনগণের সুষম উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনের সঙ্গে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটে।"

গ্রামীণ সমাজসেবা

গ্রামীণ সমাজসেবার উদ্দেশ্য

গ্রামীণ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন, দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নই গ্রামীণ সমাজসেবার মূল লক্ষ্য। গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য দিক হলো লক্ষ্যভুক্ত পরিবারের সদস্যগণকে দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক লাভজনক বিভিন্ন পেশায় বিভিন্ন বিষয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান। গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে যেসব ব্যাপক ও বিস্তৃত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল সেগুলো নিম্নরূপ-

সরকার ও জনগণের যৌথ প্রচেষ্টায় ভূমিহীন কৃষক, পশ্চাদপদ নারীসমাজ, বেকার যুব সমাজের উন্নয়ন এবং পুনর্বাসনের মাধ্যমে সুষম গ্রামীণ সমাজ গড়ে তোলা।

গণতান্ত্রিক উপায়ে সর্বস্তরের জনগণের সমন্বয়ে গ্রামীণ সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং গ্রামীণ জনগণের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশ সাধনের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক জ্ঞান এবং ধ্যান-ধারণা গ্রহণে জনগণকে উৎসাহিত, অনুপ্রাণীত ও সংগঠিত করা।

ভূমিহীন দুঃস্থ, অসহায় ও কর্মহীন লোকদের শহরমুখী প্রবণতা রোধকল্পে গ্রামীণ পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

গ্রামীণ সমাজসেবা

গ্রামীণ সমাজসেবার উদ্দেশ্য

বর্তমান নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহ একুশ শতকের পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য দল গঠনের মাধ্যমে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধকরণের দ্বারা আর্থ-সামাজিক এবং উৎপাদনশীলতার সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো-

১. আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিতকরণ, যাতে পল্লী সমাজসেবা কর্মসূচির আওতায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তার দিকে এসে সামলালের

০২. জরিপের মাধ্যমে সনাক্তকৃত লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্য হতে কর্মদর্শ (Functional groups) গঠন, তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, নেতৃত্বের উন্নয়নে সহায়তা দান এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া।

৩. ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং আয় বর্ধিত ও আর্থিকভাবে লাভবান কার্যক্রমের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

গ্রামীণ সমাজসেবা

গ্রামীণ সমাজসেবার উদ্দেশ্য

৬. বেকার এবং অর্ধবেকারদের আয় বৃদ্ধির সামর্থ্য ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান।

৭. লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে বিশেষ করে উর্বর দম্পতিদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা সীমিত রাখার জন্য পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ।

গ্রামীণ সমাজসেবা

গ্রামীণ সমাজসেবার উদ্দেশ্য

গ্রামীণ সমাজসেবার কর্ম কৌশল: গ্রামীণ সমাজসেবার ক্ষেত্রে বর্তমানে অনুসৃত তিনটি কর্ম কৌশল হলো-

১. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন স্কীমের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অংশায়নের ভিত্তিতে উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের জন্য কর্মদল গঠন (Functional groups);

২. পরিবারকে উন্নয়নের ইউনিট ধরে কর্মদলের (Functional groups) অন্তর্ভুক্ত করা;

৩. পল্লী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট খাতে কর্মরত অন্যান্য জাতিগঠনমূলক এজেন্সিগুলোর সঙ্গে সমাজসেবা কা অধিদপ্তরের কর্মচারীরা এজেন্ট হিসেবে সেবা প্রদান।

গ্রামীণ সমাজসেবা

গ্রামীণ সমাজসেবার গুরুত্ব

বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন গ্রামীণ উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। পল্লী উন্নয়ন ছাড়া বাংলাদেশের উন্নয়ন আশা করা যায় না। কিন্তু বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত। গ্রামীণ সমাজের মৌলিক সমস্যাগুলো হলো দরিদ্রতা, জনসংখ্যাস্ফীতি, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, উদাসীনতা, কুসংস্কার ইত্যাদি। এসব সমস্যাগুলো পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। যুগপৎ বহুমুখী কর্মসূচির মাধ্যমে এসব সমস্যার প্রতিরোধ করতে না পারলে, সব সমস্যাই ক্রমান্বয়ে জটিল আকার ধারণ করবে। সমন্বিত প্রচেষ্টায় গ্রামীণ সমস্যাগুলো প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্প গৃহীত।

গ্রাম বাংলার অবহেলিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সম্পদশালী স্বনির্ভর জনগোষ্ঠীতে পরিণত করার যুগান্তকারী পদক্ষেপ হলো গ্রামীণ সমাজসেবা। সমন্বিত উপায়ে রহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে গ্রামীণ সমস্যাবলী মোকাবেলা করার রাস্তবমুখী কার্যক্রম হলো পল্লী সমাজসেবা।

গ্রামীণ সমাজসেবা

গ্রামীণ সমাজসেবার কার্যক্রম

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত পশ্চাদপদ দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর অর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গ্রামীণ: সমাজসেবার কার্যক্রমসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক জরিপের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত পরিবারকে চিহ্নিত করে দল গঠন। দল গঠন। গঠনকালে মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রদান।

আয়-বৃদ্ধি ও আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য লক্ষ্য লক্ষ্যভুক্ত পরিবারকে অনধিক পাঁচ হাজার টাকা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান।

বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কার্যক্রম যথা- দর্জিবিজ্ঞান, সূচিশিল্প, পাটের কাজ, বাঁশ-বেতের কাজ, এমব্রয়ডারী, কাঠের কাজ, বৈদ্যুতিক কাজ, হাঁস-মুরগী পালন, কম্পিউটার, টাইপের কাজ, সজী চাষ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান দান।

সাক্ষর জ্ঞান ও সামাজিক শিক্ষা প্রদান।

বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞান দান।

গ্রামীণ সমাজসেবা

গ্রামীণ সমাজসেবার কার্যক্রম

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কিত জ্ঞান দান।
জলাবদ্ধ পায়খানা ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞান দান।
সামাজিক বনায়নের জন্য বৃক্ষরোপণ।
বাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ ও পুষ্টি সম্পর্কে সচেতন করা।
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য লক্ষ্যভুক্ত পরিবারকে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী প্রদানে সহায়তা করা।
লক্ষ্যভুক্ত পরিবারের সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা।

গ্রামীণ সমাজসেবা

গ্রামীণ সমাজসেবার কার্যক্রম

নিচের ছকে গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম প্রদেয় সেবাসমূহ, সেবাগ্রহীতা এবং সেবাপ্রদান কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করা হলো।

এক নজরে গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম

কার্যক্রম	প্রদেয় সেবাসমূহ	সেবাগ্রহীতা	সেবাদানকারী কর্তৃপক্ষ
পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম	• পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগণকে সংগঠিত করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনয়ন; • সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান; • ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান; • লক্ষ্যভুক্ত নারীদের সংগঠিত করে সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পুঁজি গঠনের জন্য সঞ্চয় বৃদ্ধি।	নির্বাচিত গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা, যিনি– • আর্থ সামাজিক জরিপের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তরে তালিকাভুক্ত গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের কর্মদলের সদস্য/সদস্যা ; • সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ ও অন্যান্য সেবা প্রাপ্তির জন্য 'ক' ও 'খ' শ্রেণীভুক্ত দরিদ্রতম ব্যক্তি অর্থাৎ যার মাথাপিছু বার্ষিক পারিবারিক আয় সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ; • সুদমুক্ত ঋণ ব্যতীত অন্যান্য সেবা প্রাপ্তির জন্য 'গ' শ্রেণীভুক্ত নারী যার মাথাপিছু বার্ষিক পারিবারিক আয় ২৫ হাজার টাকার উর্ধ্বে	৪৮১টি উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়

গ্রামীণ সমাজসেবা

গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচী

গ্রাম বাংলার ভূমিহীন কৃষক ও নারী সম্প্রদায়, স্বাস্থ্যহীন ও পুষ্টিহীন শিশু এবং লক্ষ্যহীন ভবঘুরে বেকার যুবকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান ও কর্মসংস্থান এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে সম্মানজনক জীবন যাপনের অঙ্গীকার নিয়ে গ্রামীণ সমাজসেবার সূচনা। বহুমুখী ও সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ সমস্যাগুলো মোকাবেলার লক্ষ্যে গ্রামীণ সমাজসেবার সামগ্রিক কর্মসূচি রচিত। এখানে গ্রামীণ সমাজসেবার প্রধান কর্মসূচিগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো-

গ্রামীণ সমাজসেবা

গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচী

১. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম: গ্রামীণ নিম্ন আয়ের জনগণ, বেকার, অর্ধবেকারসহ অন্যান্যদের বিভিন্ন বিষয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান গ্রামীণ সমাজসেবার গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এর আওতায় মৎস চাষ, পশু ও হাঁস-মুরগী পালন এবং কৃষি উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়া মূলধন বিনিয়োগ ও মূলধন সৃষ্টির জন্য সমবায় স্থাপন, ধানভাঙ্গা প্রকল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা, রিক্সা ক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত। প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এ প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় রয়েছে।

ট্রেডভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিবরণ: সেলাই ও দর্জি বিজ্ঞান, এমব্রয়ডারী, বাঁশ-বেত, বৈদ্যুতিক কার্যক্রম (ওয়ারিং, ওয়েল্ডিং এবং লোহার আসবাবপত্র তৈরি), পাটের কাজ, কাঠের কাজ, তাঁত ও বয়ন কাজ, হাঁস-মুরগী পালন, গরু মোটা তাজাকরণ, কামার ও কুমারের কার্যক্রম, সজী চাষ, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স (ফ্যান, এসি, ফ্রিজ, রেডিও, টেলিভিশন এবং কলের লাঙ্গল), টিভি, রেডিও এবং ঘড়ি মেরামত, বাই-সাইকেল এবং ঘড়ি মেরামত, কম্পিউটার ব্যবহার শিক্ষা এবং পরিচালনা, স্ন্যাকস, বেকারী, সাইকেল, রিকশাভ্যান, রিকশা মেরামত ও সংযোজন, মটর সাইকেল মেরামত।

গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচী

২. পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম: প্রতিটি ইউনিয়নে গড়ে আটটি করে মাতৃকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় এটি শুরু হয়। গ্রামীণ মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে অর্থকরী কাজে অংশগ্রহণ এবং সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে তাদের জনসংখ্যা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি জ্ঞানদান, শিশুযত্ন ও প্রতিপালন এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা দানের মাধ্যমে পারিবারিক ও জাতীয় পর্যায়ে মহিলাদের ভূমিকাকে অর্থবহ করে তোলাই মাতৃকেন্দ্রের মূল লক্ষ্য। পল্লী মাতৃকেন্দ্রের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পরিচালিত মাতৃকেন্দ্রের দু'টি বিশেষ কর্মসূচি হলো-

প্রশিক্ষণ কাম উৎপাদন কেন্দ্র: স্থানীয় কাঁচামাল এবং চাহিদার ভিত্তিতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ-কাম-উৎপাদন স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়।

মহিলা ঋণদান কর্মসূচি: মাতৃকেন্দ্রের আওতাধীন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের এবং, অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত বিত্তহীন মহিলাদের পুঁজি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংকের সহায়তায় মহিলা ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজসেবা অফিসারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে এবং সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অধীনে ঋণদান কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচী

৩ . কমিউনিটি সেন্টার (গোষ্ঠী কেন্দ্র): গ্রামীণ বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ শক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে এ কর্মসূচি গৃহীত হয়। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণদানের জন্য ১৯৬টি কমিউনিটি সেন্টার বা গোষ্ঠীকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। গ্রামীণ সমস্যা, সম্পদ এবং সমাধান সম্পর্কে গ্রামবাসীদের সচেতন করে তোলা কমিউনিটি সেন্টারের মূল লক্ষ্য।

৪. সুদমুক্ত ঋণদান: গ্রামীণ দরিদ্র ও দুঃস্থদের অন্যতম সমস্যা পুঁজির অভাব। পুঁজি সমস্যা সমাধানে সহায়তা দানের লক্ষ্যে সুদমুক্ত ঋণদান কর্মসূচি চালু করা হয়। ভূমিহীন কৃষক, বেকার যুবক এবং দুঃস্থ মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে - সুদমুক্ত ঋণদানের ব্যবস্থা করা হয়। দেশের প্রতিটি উপজেলায় ক্ষুদ্র ঋণদান কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গ্রামীণ সমাজসেবা

গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচী

৫. সম্প্রসারিত গ্রামীণ সমাজকর্ম প্রকল্প: গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম জোরদার, সম্প্রসারণ ও ব্যাপকতর করার লক্ষ্যে ১৯৭৪ সাল হতে 'সম্প্রসারিত পল্লী সমাজকর্ম' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পটি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে এ প্রকল্পের ৫টি পর্যায়ের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য গ্রামীণ ভূমিহীন ও বিত্তহীন কৃষক, বেকার যুবক, দুঃস্থ মহিলা, বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু-কিশোর, দরিদ্র ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কারিগরি দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা যোগ্যতার উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সক্রিয় সহায়তা প্রদান করা। উৎপাদনমূলক ও আয় উপার্জনকারী কর্মসূচি পরিচালনার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্কীমের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত পরিবারের উৎপাদনক্ষম ব্যক্তিকে সহজ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য সুদমুক্ত ঋণ প্রদান' এ প্রকল্পের মূল বৈশিষ্ট্য।।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – বাংলাদেশে সরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

টপিক – ০৩ পল্লী মাতৃকেন্দ্র

টপিক ০৩: পল্লী মাতৃকেন্দ্র

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

পল্লী মাতৃকেন্দ্র

গ্রামীণ-সমাজসেবার আওতায় স্থাপিত- মাতৃকেন্দ্রগুলোকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কাজে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সক্ষম দম্পতিদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করাই পল্লী মাতৃকেন্দ্রের লক্ষ্য।

মাতৃকেন্দ্রের উদ্দেশ্য: পল্লীর নারী সমাজকে মাতৃকেন্দ্রের আওতায় সংগঠিতকরণ, জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে উপার্জনশীল কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং পল্লীর নারীদের পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ। এর বাইরে মাতৃকেন্দ্রের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে পল্লীর নারীদের স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করা।

লক্ষ্যভুক্ত নারীদের পরিকল্পিত ছোট পরিবারের সুবিধা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

পল্লী মাতৃকেন্দ্র

ভূমিহীন, দরিদ্র, নিঃস্ব, দুঃস্থ, প্রতিবন্ধী এবং অনগ্রসর নারী গোষ্ঠীকে মাতৃকেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সাহায্য করা।

লক্ষ্যভুক্ত নারীদের উৎপাদন ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে পেশাগত ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।

স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মাতৃ ও শিশুসেবা, স্যানিটেশন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, নিরাপদ পানি ব্যবহার, সাক্ষরতা, সামাজিক বনায়ন এবং সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, যাতে লক্ষ্যভুক্ত নারীদের জীবনযাপন উন্নত হয়।

পল্লী মাতৃকেন্দ্র

কার্যক্রম	প্রদত্ত সেবাসমূহ	সেবাগ্রহীতা	সেবাদানকারী কর্তৃপক্ষ
পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম	• পল্লী অঞ্চলে দরিদ্র নারীদের সংগঠিত করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনয়ন; • পরিকল্পিত পরিবার তৈরিতে সহায়তা ; • জাতীয় জনসংখ্যা কার্যক্রম বাস্তবায়ন; • সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন; • ৩ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান; • লক্ষ্যভুক্ত নারীদের সংগঠিত করে সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পুঁজি গঠন।	নির্বাচিত গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা, যিনি– • আর্থ সামাজিক জরিপের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তরে তালিকাভুক্ত পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সদস্য এবং • সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ ও অন্যান্য সেবা প্রাপ্তির জন্য 'ক' ও 'খ' শ্রেণীভুক্ত দরিদ্রতম নারী অর্থাৎ যার মাথাপিছু বার্ষিক পারিবারিক আয় সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ; • সুদমুক্ত ঋণ ব্যতীত অন্যান্য সেবা প্রাপ্তির জন্য 'গ' শ্রেণীভুক্ত নারী যার মাথাপিছু বার্ষিক পারিবারিক আয় ২৫ হাজার টাকার উর্ধ্বে।	৩১৮টি উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং পল্লী এলাকায় স্থাপিত ১২,৯৫৬টি মাতৃকেন্দ্র।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – বাংলাদেশে সরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

টপিক – ০৪ শহর সমাজসেবা কর্মসূচী

টপিক ০৪: শহর সমাজসেবা কর্মসূচী

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

শহর সমাজসেবা কর্মসূচী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে শহর সমাজসেবা কর্মসূচি (Urban Social Services) অন্যতম। বাংলাদেশে সমষ্টিকেন্দ্রিক (Community Based) সামজকর্ম অনুশীলন শহর সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে শুরু হয়।

বাংলাদেশে আধুনিক সমাজকল্যাণের অর্থাৎ পেশাদার সমাজকর্মের বাস্তব প্রয়োগের সূচনা হয় ১৯৫৪ সালে ঢাকা প্রজেক্ট নামে শহর সমষ্টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে। এ প্রকল্পের সাফল্যের ভিত্তিতে ১৯৫৫ সালে ঢাকার কায়েতটুলীতে জাতিসংঘের সহায়তায় পরীক্ষামূলক শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (Urban Community Development Project-UCDP) গ্রহণ করা হয়। আলোচ্য পরীক্ষামূলক প্রকল্পের সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৭-৫৮ সালে ঢাকার গোপীবাগ, লালবাগ ও মোহাম্মদপুরে আরো ৩টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এসব পরীক্ষামূলক প্রকল্পের সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৯-৬০ সালে চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, দিনাজপুর, যশোর ও ময়মনসিংহে মোট ১২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৬১ সালে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হবার পর বাস্তব প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বাস্তব প্রয়োজনে শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

শহর সমাজসেবা কর্মসূচী

শহর সমাজসেবার ধারণা

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম হলো সমষ্টিকেন্দ্রিক সমাজসেবা কার্যক্রম। এটি শহরবাসী এবং সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত এমন একটি কার্যক্রম, যার মাধ্যমে শহরবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে শহর জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হয়। সরকারি সাহায্যপুষ্ট স্বাবলম্বন নীতির উপর পরিচালিত সমষ্টিকেন্দ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম হলো শহর সমাজসেবা।

শহর সমাজসেবা কর্মসূচী

শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

শহর সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শহর এলাকায় কার্যকরী সম্প্রদায় গড়ে তোলা। যাতে নিজস্ব এলাকার সঙ্গে জনগণের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। স্থানীয় জনগণের সমন্বিত উদ্যোগে প্রয়োজনীয় আর্থ-সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালানোই শহর সমাজসেবার মূল লক্ষ্য। পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো হলো-

সামাজিক জরিপের মাধ্যমে সমস্যা ও চাহিদা চিহ্নিতকরণ;

পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের জন্য বাস্তব তথ্যাদি সংগ্রহ করা;

দরিদ্রদের স্বকর্মসংস্থানের জন্য সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহকরণ;

বস্তিবাসীদের বসবাসের পরিবেশ উন্নয়ন;

বস্তিবাসীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান;

বিপন্ন পরিবেশে বসবাসরত শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন;

প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান;

শহর সমাজসেবা কর্মসূচী

শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরিতদের গ্রামে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধকরণ,
বস্তিবাসী এবং শহরের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধীকৃত শহরের সেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম তদারক করা;
সুবিধা ভোগীদের আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমে শিক্ষিত করে তোলা;
স্থানীয় নেতৃত্ব তৈরি এবং প্রকল্প সমন্বয় পরিষদ গঠন;
চাহিদা ও সম্পদের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনের লক্ষ্যে কল্যাণমুখী কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ;
আন্তঃদলীয় সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে দলগুলোর মধ্যে সমন্বয় ব্যবস্থার উন্নয়ন।

শহর সমাজসেবা কর্মসূচী

শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের গুরুত্ব

বৃটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশ ১৯৪৭ সালে বিভক্তির মধ্য দিয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামক দু'টি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হতে আগত মোহাজেরগণ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে বসবাস শুরু করে। পঞ্চাশের দশকে এদেশে শহরকেন্দ্রিক শিল্প কারখানা গড়ে উঠতে শুরু করলে গ্রাম থেকে লোকজন শহরে ভীড় জমাতে থাকে। এতে শহরে জনসমষ্টির বিশাল চাপ সৃষ্টি হয়। যার প্রভাবে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে ১৯৫৫ সালে শহর সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে গ্রাম হতে শহরে মানুষের স্থানান্তরের প্রভাবে শহরের সমস্যা ক্রমান্বয়ে প্রকট আকার ধারণ করে। ক্রমবর্ধমান শহরায়ন এবং গ্রাম অঞ্চলে আধুনিকায়নের জোয়ার ও জীবিকার অভাবের কারণে শহরমুখী লোকসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরমুখী লোকদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক এবং তাদের দ্বারা সৃষ্ট অন্যান্য সমস্যার একটি সুষ্ঠু সমাধানের জন্য এ কর্মসূচি যুগোপযোগী করে উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করার গুরুত্ব অপরিসীম।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের শহর এলাকার সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনে সরকার এবং শহরবাসীর নিজস্ব প্রচেষ্টাকে সুসংহত করার ক্ষেত্রে শহর সমাজ উন্নয়ন ও শহর সমাজসেবার কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। বাস্তব গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে ৬৪টি জেলায় ৮০টি কার্যালয়ের মাধ্যমে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

শহর সমাজসেবা কর্মসূচী

শহর সমাজসেবা কর্মসূচির কার্যক্রম

সংক্ষেপে শহর সমাজসেবার কার্যক্রমগুলো উল্লেখ করা হলো।

১. আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত পরিবার ও দল চিহ্নিতকরণ;

২. লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে দল গঠন;

৩. আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ;

৪. সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ;

৫. আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন;

৬. নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্তসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দলীয় সভায়

শহর সমাজসেবা কর্মসূচী

শহর সমাজসেবা কর্মসূচির কার্যক্রম

সাক্ষরতা কর্মসূচি;
পরিবার পরিকল্পনা;
প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি;
টিকাদান কর্মসূচি;
খাবার স্যালাইন প্রস্তুতকরণ;
বিশুদ্ধ নিরাপদ পানি;
নিরাপদ স্যানেটারি পায়খানা ব্যবহার;
সামাজিক বনায়ন।

শহর সমাজসেবা কর্মসূচী

শহর সমাজসেবা কর্মসূচির কার্যক্রম

শহরাঞ্চলে বসবাসরত জনগণের বিভিন্নমুখী সমস্যা যথা- অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, চরম দারিদ্র্য ও বেকারত্ব, অধিক জনসংখ্যাধিক্য, পুষ্টিহীনতা, নিরক্ষরতা, অপরাধ ও কিশোর অপরাধ প্রবণতা, ভিক্ষাবৃত্তি, পারস্পরিক সহানুভূতি ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি সমাধানের জন্য প্রয়োজন জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি যৌথ প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন। এ লক্ষ্যে শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের লক্ষ্যভুক্ত জনগণের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য নিচের কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম: শহর এলাকার শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলা, স্বপ্ন আয় সম্পন্ন ও দরিদ্র পরিবারের আয় বৃদ্ধি এবং বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র এবং সেলাই ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বেকার, অর্ধ-বেকার, অদক্ষ ও স্বল্প আয়ের মহিলা এবং পুরুষদের আর্থিক আয় বৃদ্ধিতে সহায়তাদান প্রশিক্ষণ এ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। কম্পিউটার, রেডিও টিভি মেরামত, ফটোগ্রাফী, কাঁচের চুড়ি ও আয়না তৈরি, বাঁশ ও বেতের কাজ, ফ্রিজ এসি মেরামত; দর্জি বিজ্ঞান, কা: এন্ড্রয়ডারি, বাটিক ও ব্লক, ফুল তৈরি, কনফেকশনারি ও ফাস্টফুড তৈরি, মোমের শো-পিচ তৈরি, ...চাইনিজ রান্না, চামড়ার ব্যাগ তৈরি, সূচিশিল্প, পোশাক তৈরি, পাটের কাজ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি মেরামত, ইত্যাদি ট্রেড প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। বোলে সমেতার সাঙ্গীতি ও জয়কে দেবতাকারীর

শহর সমাজসেবা কর্মসূচী

শহর সমাজসেবা কর্মসূচির কার্যক্রম

শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম: শহর। সমাজসেবার 'গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হলো। শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম। নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রাথমিক ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষাদান ইত্যাদি কর্মসূচি চালু রয়েছে। এছাড়া শহরবাসীদের মধ্যে নিজেদের সমস্যা, সম্পদ, নেতৃত্বের বিকাশ ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করাও শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

চিত্তবিনোদন কার্যক্রম : খেলার মাঠ ও শিশুপার্ক স্থাপন, খেলাধূলার আয়োজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জাতীয় উন্নয়ন ও জনসংখ্যা বিষয়ক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন ইত্যাদি চিত্তবিনোদন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। অবসর যাপন ও সামাজিক মেলামেশার জন্য কম্যুনিটি সেন্টার স্থাপন শহর সমাজসেবার বিশেষ কার্যক্রম।

শহর সমাজসেবা কর্মসূচী

শহর সমাজসেবা কর্মসূচির কার্যক্রম

নিচের ছকে একনজরে শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় প্রদেয় সেবাসমূহ, সেবাগ্রহীতা এবং সেবাদানকারী কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করা হলো।

এক নজরে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম

কার্যক্রম	প্রদেয় সেবা	সেবাগ্রহীতা	সেবাদানকারী কর্তৃপক্ষ
শহর সমাজসেবা কার্যক্রম	• শহর এলাকায় দরিদ্র জনগণকে সংগঠিত করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনয়ন; • সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান; • ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান; • লক্ষ্যভুক্ত ব্যক্তিদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পুঁজি গঠন।	নির্বাচিত মহল্লার স্থায়ী বাসিন্দা, যিনি– • আর্থ সামাজিক জরিপের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তরে তালিকাভুক্ত শহর মাতৃকেন্দ্রের সদস্য; • সুদমুক্ত ঋণ ও অন্যান্য সেবা প্রাপ্তির জন্য 'ক' ও 'খ' শ্রেণীভুক্ত দরিদ্রতম ব্যক্তি যার মাথাপিছু বার্ষিক পারিবারিক আয় সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত; • সুদমুক্ত ঋণ ব্যতীত অন্যান্য সেবা প্রাপ্তির জন্য 'গ' শ্রেণীভুক্ত নারী যার মাথাপিছু বার্ষিক পারিবারিক আয় ১০ হাজার টাকার উর্ধে	• ৬৪টি জেলা শহরে ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়

উৎস : সিটিজেন চার্টার, সমাজসেবা অধিদপ্তর।

শহর সমাজসেবা কর্মসূচী

শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

শহর সমাজসেবা একটি সমষ্টিকেন্দ্রিক সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম। সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি (Community Social work) এতে প্রয়োগ করা হচ্ছে। সমষ্টি সমাজকর্মের বিশেষ দুটি প্রক্রিয়া হলো: সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন (Community Organization and Community Development)। শহর সমাজসেবা কার্যক্রম সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে।

পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ না পেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠী শহর এলাকায় ক্রমশ ভিড় জমায়। স্বাভাবিকভাবে পল্লীর সমস্যাগুলো ক্রমান্বয়ে শহরে স্থানান্তরিত হয়। বাসস্থানের অভাব, বস্তির নোংরা পরিবেশ,, অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতা, চিত্তবিনোদন, কর্মসংস্থান ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাবে বেকারত্ব, অপরাধ প্রবণতা, জনস্বাস্থ্যের অবনতি, অসামাজিক কার্যকলাপ ইত্যাদি সমস্যায় বাংলাদেশের শহর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে।

শহর সমাজসেবা কর্মসূচী

শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

এসব সমস্যা সমাধান সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন এমন এক ভারসাম্যমূলক প্রক্রিয়া, যাতে সরকার ও জনগণের যৌথ প্রচেষ্টায় উদ্ধৃত সমস্যাবলীর মোকাবেলা করা যায়। সরকারি ও স্থানীয় উদ্যোগের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এসব সমস্যার কার্যকরী সমাধান দেয়া সম্ভব। এরূপ যৌথ প্রচেষ্টা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া হচ্ছে সমাজকর্মের সমষ্টি, উন্নয়ন পদ্ধতি। শহর সমাজসেবার দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে সমাজকর্মের জনসমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি।

শহর সমাজসেবার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনয়ন। দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে আলোচ্য উদ্দেশ্য অর্জনের সুযোগ রয়েছে।

শহর সমাজসেবার অন্যতম লক্ষ্য হলো সামাজিক জরিপের মাধ্যমে সমস্যা ও চাহিদা চিহ্নিত এবং বাস্তব তথ্যাদি সংগ্রহ করা। এসব লক্ষ্যার্জনে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সমাজকর্ম গবেষণা কৌশল প্রয়োগ করা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – বাংলাদেশে সরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

টপিক – ০৫ কিশোর কিশোরী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান

টপিক ০৫: কিশোর কিশোরী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

কিশোর কিশোরী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান

শিশু কল্যাণ এবং অপরাধপ্রবণ শিশুদের সংশোধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪ প্রণীত হয়।
শিশু আইন ১৯৭৪ এর মূল উদ্দেশ্য ছিল-
১৬ বছরের নিচের বয়সের শিশু ও কিশোর অপরাধীদের বয়স্ক ও পেশাদার অপরাধীদের থেকে আলাদা রেখে বিচার কার্য পরিচালনা করা।
সাজাপ্রাপ্ত শিশু ও কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের লক্ষ্যে শিশু বিধি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ।
শিশু ও কিশোরের চরিত্র সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ।
কিশোরদের স্বকর্মসংস্থানে সহায়ক করে গড়ে তোলার জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।
অপরাধ প্রবণ শিশু কিশোরদের স্বাভাবিক শিশু কিশোরদের মতো গড়ে তোলার জন্য সাধারণ শিক্ষা দান।
বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪ এর ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশে ৩টি কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০১৩-এর তথ্যানুযায়ী ৩টি কিশোর কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে উপকারভোগীর সংখ্যা ১৬,২২১ জন।

কিশোর কিশোরী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান

ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে ১৯৭৬ সালে কিশোর আদালত, কিশোর হাজত এবং সংশোধন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে "জাতীয় কিশোর অপরাধ সংশোধন ইনস্টিটিউট" প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭৮ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চালু হয়। বর্তমানে এর নাম জাতীয় কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান।

কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের ক্ষেত্রে কিশোর উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের সাফল্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেশব্যাপী অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের সংশোধন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আরো সংশোধনী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে খুলনা বিভাগের যশোর জেলা সদরে ১৯৯৫ সালে দ্বিতীয় কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। এ কেন্দ্রে ১৫০ জন নিবাসী রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কার্যক্রমের গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন গাজীপুর জেলার কোনাবাড়িতে দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কিশোরী অপরাধীদের সংশোধনের জন্য ১৫০ আসন বিশিষ্ট জাতীয় কিশোরী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বাংলাদেশে কিশোরী অপরাধীদের জন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠান এটাই প্রথম। কিশোরীদের নানাবিধ সমস্যার সমাধান ও অপরাধ সংশোধনের লক্ষ্যে জাতীয় কিশোরী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে রাজশাহী, বরিশাল ও চট্টগ্রামে আরো ৩টি কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছিল।

কিশোর কিশোরী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান

কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থান-

জাতীয় কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান- টঙ্গী, গাজীপুর

জাতীয় কিশোরী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান- কোনাবাড়ী, গাজীপুর

জাতীয় কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান- পুলেরহাট, যশোর

কিশোর কিশোরী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান

কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য

অপরাধপ্রবণ কিশোরদের শাস্তি নয়, সংশোধনই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিশোরদের সংশোধনের ব্যবস্থা।

অপরাধপ্রবণ কিশোরদের কারাগারে অন্যান্য দাগী আসামীদের সাথে বিচারকার্য সম্পাদন না করে বিশেষ ধরনের কিশোর আদালতে বিচারকার্য পরিচালনা করা এবং কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে থাকার ব্যবস্থা করা।

কিশোরদের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষতার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ ও সর্বাত্মক সহযোগিতা করা।

নানাবিধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অপরাধপ্রবণ কিশোরদের কর্মমুখী ও স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা।

শরীর চর্চা, খেলাধূলা, চিত্তবিনোদন ও অন্যান্য অনুশীলনের মাধ্যমে কিশোরদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন ও শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দান করা।

সমাজকে অপরাধ প্রসারের হাত থেকে রক্ষা করা।

কিশোর কিশোরী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান

কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম

কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তিনটি হলো কিশোর হাজত, কিশোর আদালত এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এ তিনটি কার্যক্রম সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. কিশোর হাজত (Juvenile Remand Home) : জাতীয় কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ হচ্ছে কিশোর হাজত। কিশোর অপরাধীদের বিচারের পূর্বে বা বিচার চলাকালীন সময়ে অথবা বিচারের পর সংশোধনের জন্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত যেখানে রাখা হয়, তাকেই আটক নিবাস বলা হয়। সাধারণ জেল হাজতের কু-প্রভাব হতে শিশু-কিশোর অপরাধীদের মুক্ত রাখার লক্ষ্যেই এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখানে কিশোর অপরাধীদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়।

আটক নিবাসের প্রশাসক, সমাজকর্মী, আদালতের কর্মকর্তা এবং শিশু বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়। এতে শিক্ষা, চিত্তবিনোদন, নৈতিক উন্নয়নের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা রয়েছে। কিশোর অপরাধীদের অপরাধ প্রবণতা দূরীকরণে এসব ব্যবস্থা অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করে।

২. কিশোর আদালত (Juvenile Court): কিশোর অপরাধীদের বিচারের জন্য বিশেষ ধরনের আদালতকেই কিশোর আদালত বলা হয়। এতে অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের চেষ্টা করা হয়। সাধারণ আদালতের মতো বাদী-বিবাদী, আইনজীবী নিয়োগ ও শাস্তিদানের ব্যবস্থা এতে নেই। প্রবেশন অফিসার বা সমাজকর্মী, অপরাধীদের আত্মীয়-স্বজন এবং সংশ্লিষ্টদের উপস্থিতিতে আদালতের পক্ষ হতে অপরাধের কারণ, ধরন, সংশোধন এবং পুনর্বাসনের উপায় ইত্যাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

উল্লেখ্য কিশোর আদালত স্থাপনের আইনগত ভিত্তি রচিত হয় আমেরিকাতে। ১৮৯৯ সালের ১ জুলাই শিকাগো শহরে সর্বপ্রথম কিশোর আদালত স্থাপন করা হয়। বর্তমানে বিশ্বের সব দেশেই কিশোর আদালত কিশোর অপরাধীদের সংশোধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। জাতীয় কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো কিশোর আদালত। এখানে যেসব অপরাধীদের বয়স ১৬ বছরের নিচে শুধু তাদের বিচার করা হয়। ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের বিধান অনুযায়ী এটি গঠিত। প্রথম শ্রেণীর একজন ম্যাজিস্ট্রেট, সমাজকর্মী, মনোবিজ্ঞানী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মচারীর সমন্বয়ে এটি গঠিত। এখানে সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, সমাজকর্মী, মনোচিকিৎসক, অপরাধীর পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে কিশোর অপরাধীর অপরাধের সার্বিক দিক বিশ্লেষণ। কেরে সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

কিশোর কিশোরী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান

কিশোর আদালতে মামলা দায়েরের নিয়মাবলি: কিশোর আদালতে অভিভাবক কেস এবং পুলিশ কেস এ দু'ধরনের অপরাধীদের বিচার করা হয়।

অভিভাবক কেস : ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের ধারা অনুযায়ী শিশুর আইনসঙ্গত অভিভাবক অবাধ্য বা অপরাধপ্রবণ কোন কিশোরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারেন। মামলা দায়েরের পর ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় অভিভাবকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কিশোর অপরাধীকে কিশোর হাজতে রাখার হুকুম দেন এবং চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য তারিখ ঘোষণা করেন। মধ্যবর্তী সময়ে প্রবেশন অফিসারের মাধ্যমে মামলাটি তদন্ত করান। প্রবেশন অফিসার অপরাধপ্রবণ কিশোরের সার্বিক দিক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টের ভিত্তিতে চূড়ান্ত বিচারকার্য সম্পন্ন করা হয়।

পুলিশ কেস: যেসব কিশোর বাংলাদেশ-দণ্ডবিধি মোতাবেক কোন অপরাধ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়ে থাকে, তাদের বিচারও, কিশোর আদালতে সম্পন্ন: হয়। যে কোন আদালত হতে মামলাগুলো কিশোর আদালতে স্থানান্তর করা যায়। এসব মামলা পরিচালনার সময় একজন পুলিশ কর্মকর্তা উপস্থিত, থাকেন। এসব মামলার ক্ষেত্রে আসামীর পক্ষে উকিল নিয়োগ করা যেতে পারে।

কিশোর কিশোরী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান

৩. প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা সংশোধনী প্রতিষ্ঠান (Taining Institure): এটি কিশোর অপরাধ সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বিচারে দোষী সাব্যস্ত এবং প্রাতিষ্ঠানিক -:: সংশোধনের প্রয়োজন হলে অপরাধপ্রবণ কিশোরদের এখানে রাখা হয়। এখানে আনয়নের পর অপরাধপ্রবণ কিশোরদের যাবতীয় দায়িত্ব এ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ পালন করে। এ প্রতিষ্ঠানে ২০০ *জন কিশোরের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে দরিদ্র, অসহায়, পরিত্যক্ত কিশোর অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের সাথে সাথে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যাতে করে ভবিষ্যত জীবনে তারা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসিত হয়ে স্বনির্ভর জীবন-যাপনে সক্ষম হয়ে উঠে। এখানে অবস্থানকারীদের শারীরিক গঠন, শিক্ষার মান, আগ্রহ, বুদ্ধিমত্তা ও মননশীলতা পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করে কারিগরি শিক্ষার কোর্স নির্বাচন করা হয়। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মধ্যে রয়েছে- রাজমিস্ত্রি, কাঠশিল্প, মোটর গাড়ি চালান ও মেরামত, দর্জি বিজ্ঞান, রেডিও, টেলিভিশন, মেরামত, চুল কাটা ইত্যাদি। এছাড়া নিবাসীদের সুপ্ত প্রতিভা, বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির জন্য শারীরিক পরিশ্রম, বিচিত্রানুষ্ঠান, পিকনিক ও পর্যাপ্ত খেলাধূলার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

কিশোর কিশোরী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান

জাতীয় কিশোরী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন, সমাজসেবা অধিদপ্তর দেশের-কিশোর অপরাধীদের সংশোধন, শিক্ষা ও পুনর্বাসনের জন্য কিশোর, সংশোধনী, প্রতিষ্ঠান, স্থাপন করা হলেও কিশোরীদের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান, ছিল না। ফলে সাজাপ্রাপ্ত ও অন্যান্য কারণে জেলে, আটককৃত কিশোরীদের সংশোধন ও পুনর্বাসনের জন্য একটি পৃথক সংশোধনী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে গাজীপুর জেলার কোনাবাড়ীতে ১৫০ আসন বিশিষ্ট জাতীয় কিশোরী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, স্থাপন করা হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। শিশু আইন ১৯৭৪ এর বিধানে অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বয়সের বালিকাকে কিশোরী বলা হয়। বিভিন্ন অপরাধে বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত। এ সকল। কিশোরীদের জেলখানায় না রেখে শিশু আইনের আওতায় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সোস্যাল কেইস ওয়ার্ক, কাউন্সেলিং ও অন্যান্য সংশোধনী কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের সংশোধন এবং আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসন এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

কিশোর কিশোরী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান

কার্যক্রম: কিশোরী সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে নিচের তিনটি কার্যকরী ইউনিট রয়েছে

কিশোরী আদালত ((Juvenile Court);

কিশোরী হাজত (Remand Home);

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (Training Institute)

বাস্তবায়িতব্য কর্মসূচি: এ প্রতিষ্ঠানের আওতায় যে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে সেগুলো হলো--

নিবাসীদের ভরণ-পোষণ, প্রযত্ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান।

নিবাসীদের চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ।

ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা, সোস্যাল কেইস ওয়ার্ক, মটিভেশন, কাউন্সেলিং ও অন্যান্য উপযোগী পন্থায় নিবাসীদের চরিত্র গঠন, মানবিক উন্নয়ন, সংশোধন ও পুনর্বাসন। মায়াচ সোস

সাধারণ শিক্ষা কর্মসূচি।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ

বাংলাদেশে জাতীয় কিশোরী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানটিতে দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কিশোরী অপরাধী ও প্রবণ শিশু-কিশোরী সংশোধিত হয়ে সমাজের শিক্ষিত ও দক্ষ * জনশক্তিতে জনশক্তিতে রূপান্তরিত রূপান্তরিত হবে। অপরাধপ্রবন কিশোরীরা ভবিষ্যতে স্বনির্ভরতা অর্জনপূর্বক উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে উৎপাদ্রনৃশীত নাগরিক হিসেবে দেশের সার্বিক উন্নয়নে ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

কিশোর কিশোরী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

Centre Practice of Social Work Methods in Juvenile Development

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের তিনটি প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম হলো কিশোর আদালত, কিশোর হাজত এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা সংশোধন কেন্দ্র। এই তিনটি কার্যক্রমে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রয়োগ করা হয়।

মনোবিজ্ঞানী, পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেটসহ অন্যান্য পেশাদার ব্যক্তিদের সঙ্গে 'সমাজকর্মীরাও কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। অপরাধপ্রবণ কিশোর-কিশোরীদের আচরণ সংশোধনে সমাজকর্মীরা ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির (Social Case Work Methady বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করেনও চশমাট

অপরাধপ্রবণ কিশোর-কিশোরীদের সমস্যা সমাধানে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের। সুযোগ রয়েছে। অপরাধপ্রবণ কিশোরদের নিয়ে ট্রিটমেন্ট গ্রুপ (Treatment group) গঠন করে দলীয় অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করা যায়। অপরাধ প্রবণতা সংশোধনে ট্রিটমেন্ট গ্রুপ গঠনের গুরুত্ব অপরিসীম। অন্যদিকে অপরাধ প্রবণ কিশোর-কিশোরীদের আর্থ-সামাজিক তথ্যাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে, গবেষণা পারত্রি। প্রয়োগা করা হয়। জাতীয় কিশোর উন্নয়ন, প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম এবং সমাজকর্ম, গবেষণা এ. তিনটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – বাংলাদেশে সরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

টপিক – ০৬ বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন ও কার্যক্রম

টপিক ০৬: বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন ও কার্যক্রম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ গ ঘ

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন ও কার্যক্রম

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে স্বীকৃত। তদুপরি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট প্রতিকূল দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশ বাংলাদেশকে বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশে পরিণত করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সংশ্লিষ্ট সমীক্ষা ও মূল্যায়নে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। যদিও জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের অবদান নেই বললেই চলে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের নির্দোষ শিকার। বাংলাদেশে বন্যা, খরা, সাইক্লোন, অতিবৃষ্টি, সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা প্রভৃতির প্রকোপ বেড়েই চলেছে। বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা এবং প্রকোপতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ১৯৭০, ১৯৯১ ঘূর্ণিঝড়, সিডর ২০০৭, আইলা ২০০৯ এবং ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ এবং ২০০৭ এর ভয়াবহ বন্যাসহ সম্প্রতি বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় সিডর ও মহাসেন উল্লেখযোগ্য। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন ও কার্যক্রম

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারের ভিশন -Disaster Management Vission

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারের অন্যতম ভিশন হচ্ছে-

প্রথমত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক, পরিবেশগত এবং মানবসৃষ্ট বিপদসমূহের প্রভাবে জনসাধারণ বিশেষ করে দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিতদের বিপদাপন্নতা হ্রাস করে তাদেরকে একটি সহনীয় মানবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা। দ্বিতীয়ত বড় মাত্রার দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলায় সক্ষম একটি দক্ষ জরুরি সাড়া প্রদান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ এর প্রধান প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো-

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত অভিযোজন কার্যক্রমকে

জাতীয় নীতি, প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ;

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান;

খাদ্য ও কর্মের অভাবের সময় দরিদ্র জনগণের খাদ্যপ্রাপ্তি সহজকরণ;

দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জরুরি মানবিক সহায়তা প্রদান;

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও কর্মসৃজন; দেশালা টকজামাল

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকি হ্রাস ক্ষমতা জোরদারকরণ; তাজী-কাকী দেশাত

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সহায়ক ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ।

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন ও কার্যক্রম

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

Disaster Management Activities

বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে বাস্তবায়িত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গৃহীত পরিকল্পনা

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা (Bangladesh Climate change strategy and Action Plan): জলবায়ু পরিবর্তনের সুদূর প্রসারী প্রভাবের গুরুত্ব অনুধাবন করতে আলোচ্য কম্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় এমন একটি সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এই কর্ম পরিকল্পনার অধীন গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকার নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছে। ট্রাস্ট ফান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনে ট্রাস্ট আইন ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের আওতায় ২০১৮ পর্যন্ত ৬৮৭টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। ১১১ প্রতীশান

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন ও কার্যক্রম

জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (National Adaptation Plan-NAP) দীর্ঘ মেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সমন্বিতভাবে অভিযোজন কৌশল ও করণীয় নির্ধারণকল্পে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন কর্মকাঠামোর (United Nations Frame Work Convention on Climate Change -UNFCCE) আওতায় বাংলাদেশ জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ (UNFCCC) এ সক্রিয় সদস্য হিসেবে অভিযোজন দুপুর-রাতে ও প্রশমন খাতে কতগুলো কার্যক্রম চিহ্নিত করে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ১০ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করায় লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর নিজস্ব সক্ষমা পাঁচ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর নিজস্ব বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০; জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণীত হয়েছে। টেকসই পানি, প্রতিবেশ, পরিবেশ ও ভূমি ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন এই পরিকল্পনার লক্ষ্য।

জলবায়ু পরিবর্তন সংকটে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন: জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রম বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়নের লক্ষ্যে গ্রীন ক্লাইমের ফাণ্ড (Green Climate Fund-GCF) গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ উক্ত ফান্ড থেকে জলবায়ু অর্থ প্রাপ্তির জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০১৮ সালের যে পর্যন্ত বাংলাদেশের তিনটি প্রকল্প গ্রীণ ক্লাইমেট ফান্ড অনুমোদন করেছে। যার প্রাককলিত ব্যয় ৮৫.৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯ পৃ. ২১৫)

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে জাতীয় নীতি, প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ;

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন এবং এ সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশাবলী হালনাগাদ করণ;

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-১৫ অনুমোদন;

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (SAARC) সদস্য রাষ্ট্রগুলোর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ও পরিকল্পনা সমন্বিতকরণের মাধ্যমে সার্ক প্লান অব এ্যাকশন ফর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট (SAARC Plan of Action for Disaster Management) তৈরিতে সহায়তা করা।

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন ও কার্যক্রম

২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকি হ্রাস ক্ষমতা জোরদারকরণ: ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলার প্রস্তুতির লক্ষ্যে দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক গড়ে তোলা হচ্ছে। দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ পরবর্তী বিপদাপন্নতা হ্রাসে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ খরা সহনশীল ধানের প্রজাতি নেরিকা'র পাইলটিং চাষ শুরু করেছে। সমাজভিত্তিক ঝুঁকি হ্রাস পর্যালোচনা এবং ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন-এর প্রতিফলন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সহায়ক ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ: বাংলাদেশে ৪১০ টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ৭৫টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ৭৪টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ এবং ১৭৪টি নির্মাণের প্রকল্প নেয়া হয়েছে।

৪. ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগে উদ্ধার ও অনুসন্ধান তৎপরতায় সক্ষমতা বৃদ্ধি: ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি, কন্টিনজেন্সী প্ল্যান তৈরি, বিল্ডিং কোড বাস্তবায়ন, প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন ও কার্যক্রম

৫. দুর্যোগ-পূর্ববর্তী সতর্কীকরণ কার্যক্রম :

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দুর্যোগ বার্তা প্রচার পদ্ধতি;

আইডির (Interactive Voice Response); আবহাওয়া ও দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য ও সতর্ক

বার্তা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়।

মোবাইল ক্ষুদ্রবার্তা (SMS) প্রেরণ;

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র স্থাপন।

৬. সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম: ছাত্রছাত্রীদের দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তৃতীয় হতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের ৪১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কারিকুলামে দুর্যোগ 'ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন ও কার্যক্রম

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের অধীনে বাস্তাবায়িত প্রধান প্রকল্পসমূহ

১. কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম-সিডিএমপি (২য় পর্যায়): ইউএনডিপির অর্থায়নে প্রকল্পটির প্রথম পর্যায়ে (Phase-I) এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের (Phase-II) ২০১০ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত মেয়াদ।

কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজম্যান্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি) প্রকল্পের আওতায় ২০১০-১৪ সালে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ-

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে দু'হাজার ইউনিয়নে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

১২টি প্রধান মন্ত্রণালয়কে তাদের পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস নীতি অর্ন্তভুক্ত করতে সহায়তা করা;

৭টি বিভাগে ৭টি পরীক্ষামূলক দুর্যোগ সহনশীল গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা;

কাঠামো ও অ-কাঠামোগত উদ্যোগের মাধ্যমে এক কোটি বিপদাপন্ন মানুষকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঝুঁকি হ্রাসে সহায়তা করা;

ভূমিকম্পের ঝুঁকি ও আটটি প্রধান শহরের জন্য ওয়ার্ডভিত্তিক ভূমিকম্প কন্টিনজেন্সি পরিকল্পনা তৈরি;

২. খানাগুলোর সম্পদে প্রবেশাধিকার ক্ষমতা জোরদারকরণ, কর্মসূচি (Programme for Strengthening household access to Resources): পাঁচ বছর মেয়াদি এই কর্মসূচিটির লক্ষ্য হচ্ছে খুলনা বিভাগের তিনটি উপজেলার উপকারভোগী পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা দূর করা ও দুর্যোগ-পূর্ব সতর্কীকরণ ও দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলার ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি কমিয়ে আনা।

৩. ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি): এ প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে আগাম সতর্ককরণ, আশ্রয়, অনুসন্ধান ও উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন-এর ক্ষেত্রে সফলতার সাথে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ঘূণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচিতে উপকূলীয় ১৩টি জেলার আওতাধীন ৩৭টি উপজেলার ৩২২টি ইউনিয়নে মোট ৩ হাজার ২৯১টি ইউনিট কাজ করছে। এসব ইউনিটে ৪৯ হাজার ৩৬৫ জন (১৬ হাজর ৪৫৫ জন মহিলা) সাংকেতিক যন্ত্রাদি সজ্জিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সমাজকর্মের প্রয়োগ

Social Work Practice in Disasler Management Activities

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি ও সাড়াদান ব্যবস্থায় সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। তবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমাজকর্মের পদ্ধতিগুলো সরাসরি প্রয়োগের সুযোগ কম। সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন এবং সহায়ক পদ্ধতি সামাজিক কার্যক্রম (Social action) প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ও পরিকল্পনা হালনাগাদকরণ কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা অংশগ্রহণ করতে পারে। সামাজিক গবেষণা ও জরিপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত নীতি নির্ধারকদের সমাজকর্মীরা সহায়তা করতে পারেন।

সমাজভিত্তিক ঝুঁকি হ্রাস এবং ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকি হ্রাস ক্ষমতা জোরদারকরণে, সমষ্টি উন্নয়ন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন করে তোলা যায়। দল সমাজকর্মের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা প্রয়োগ করে কার্যকর দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ে তোলায় সমাজকর্মীরা সাহায্য করতে পারেন।

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন ও কার্যক্রম

সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি হলো সামাজিক কার্যক্রম (Social action)। পরিকল্পিত ও সুসংগঠিত দলীয় প্রচেষ্টা হলো সামাজিক কার্যক্রম। যোগাযোগ, তথ্য ও শিক্ষামূলক প্রচারণা এবং সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি ও পেশাদার গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে আইন পরিষদ গঠন সামাজিক কার্যক্রম প্রয়োগের কৌশল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি ও সাড়াদান ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে সামাজিক কার্যক্রমের উপরোক্ত প্রয়োগ কৌশল অনুশীলন করা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – বাংলাদেশে সরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

টপিক – ০৭ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

টপিক ০৭: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বাংলাদেশের সুশীলসমাজ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের দাবি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছিল। সুশীলসমাজ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী তাদের পেশকৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও সুপারিশমালা সরকারের কাছে পেশ করে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার যুক্তি তুলে ধরে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই, সুশীল সমাজের সঙ্গে বিস্তৃত পরামর্শ ও সুপারিশের আলোকে ১৯৯০-এর শেষ দিকে একটি খসড়া আইন প্রণয়ন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৬ সালে প্রথম একটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনের উদ্যোগ নেয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০০৭-এর মাধ্যমে ২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সীমিত পরিসরে কাজ শুরু করে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

২০০৭ সালে প্রণীত এই অধ্যাদেশ বাতিল করে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ১৯৯৩ সালে গৃহীত 'প্যারিস নীতিমালা'র আলোকে ২০০৯ সালের ১৪ জুলাই জাতীয় সংসদে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ পাস করা হয়। ১৯৯৩ সালের জাতিসংঘের সাধারণ সভায় গৃহীত 'প্যারিস নীতিমালা'য় বলা হয় যে, জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান গঠনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, কার্যকারিতা এবং সকলের প্রতিনিধিত্বেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। প্যারিস নীতিমালা এবং ২০০৯-এর মানবাধিকার আইন অনুসারেই একটি স্বাধীন এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন' প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

মানবাধিকার কমিশনের কার্যাবলি Functions of Commission

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ অনুযায়ী কমিশন এখানে বর্ণিত সকল বা যেকোন কার্যাবলি সম্পাদন করবে।

(ক) কোন ব্যক্তি, রাষ্ট্রীয় বা সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন কর্তৃক মানবাধিকার লংঘন বা লংঘনের প্ররোচনা সম্পর্কিত কোন অভিযোগ স্বতন্ত্র বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে তদন্ত করা;

(খ) কোন জনসেবক কর্তৃক মানবাধিকার লংঘন বা লংঘনের প্ররোচনা বা অনুরূপ লংঘন প্রতিরোধে অবহেলা করা সম্পর্কিত কোন অভিযোগ স্বতন্ত্র বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে তদন্ত করা;

(গ) জেল বা সংশোধনাগার, হেফাজত, চিকিৎসা বা ভিন্নরূপ কল্যাণের জন্য মানুষকে আটক রাখা হয়, এমন কোন স্থানের বাসিন্দাদের বসবাসের অবস্থা পরিদর্শন করা এবং এরূপ স্থান ও অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা;

(ঘ) মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য সংবিধান আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা এবং তাদের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

(ঙ) মানবাধিকার সংরক্ষণের পথে বাধা স্বরূপ সন্ত্রাসী কার্যক্রমসহ বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা এবং যথাযথ প্রতিকারের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(চ) মানবাধিকার বিষয়ক চুক্তি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদির উপর গবেষণা করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

(ছ) আন্তর্জাতিক মানবাধিকার এর মানের সাথে কোন প্রস্তাবিত আইনের সাদৃশ্য পরীক্ষা করা এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলের সাথে তাদের সমন্বয় নিশ্চিত করার স্বার্থে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় সংশোধন সুপারিশ করা;

(জ) আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলের অনুসমর্থন বা তাতে স্বাক্ষর প্রদানে সরকারকে পরামর্শ প্রদান এবং তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

(ঝ) মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা করা এবং শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানে তা ঝস্তবায়নে ভূমিকা পালন করা;

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(ঞ) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে মানবাধিকার শিক্ষার প্রচার এবং প্রকাশনা ও অন্যান্য উপায়ে মানবাধিকার সংরক্ষণ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা;

(ট) মানবাধিকার বিষয়ে বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ প্রদান এবং ঐ জাতীয় সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমন্বয় করা;

(ঠ) মানবাধিকার লংঘন বা লংঘিত হতে পারে এমন অভিযোগের উপর তদন্ত ও অনুসন্ধান করে মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে অভিযোগের নিষ্পত্তি করা;

(ড) মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা;

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাস্তবায়িত প্রধান কার্যাবলি

Implemented Main Functions of HRC

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উপরোক্ত সাধারণ কার্যাবলি অনুসারে কমিশন নিচের প্রধান কার্যাবলি সম্পাদন করে।

১. কোন ব্যক্তি, রাষ্ট্রীয় বা সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন কর্তৃক মানবাধিকার লংঘন বা লংঘনের প্ররোচনা সম্পর্কিত কোন অভিযোগ স্বতন্ত্র বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে তদন্ত করা;

২. জেল বা সংশোধনাগার, হেফাজত, চিকিৎসা বা ভিন্নরূপ কল্যাণের জন্য মানুষকে আটক রাখা হয়, এমন কোন স্থানের বাসিন্দাদের বসবাসের অবস্থা পরিদর্শন করা এবং এরূপ স্থান ও অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা;

৩. মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য সংবিধান আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা এবং তাদের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

৪. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলের অনুসমর্থন বা তাতে স্বাক্ষর প্রদানে সরকারকে পরামর্শ প্রদান এবং তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

৫. মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা করা এবং শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানে তা বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করা;

৬. সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে মানবাধিকার শিক্ষার প্রচার এবং প্রকাশনা ও অন্যান্য উপায়ে মানবাধিকার সংরক্ষণ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা;

৭. মানবাধিকার বিষয়ে বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ প্রদান এবং ঐ জাতীয় সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমন্বয় করা;

৮. মানবাধিকার লংঘন বা লংঘিত হতে পারে এমন অভিযোগের উপর তদন্ত ও অনুসন্ধান করে মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে অভিযোগের নিষ্পত্তি করা;

৯. মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করা।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমে সমাজকর্মীর ভূমিকা

Role of Social Worker in the Human Rights Commission's Activities

মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার (Human Rights and Social Justice) এর সঙ্গে সমাজকর্মের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মানবাধিকার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজকর্মীরা কাজ করে থাকে। বাংলাদেশে মানবাধিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালিত। সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজকর্মীরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে পারে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি। মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা অংশগ্রহণ করতে পারে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন শিশু অধিকার, বাল্যবিয়ে, নারী-পুরুষের বৈষম্য, শিশুশ্রম, নারীর প্রতি সহিংসতা, মানব পাচার এবং কিশোর অপরাধের বিচার কার্য বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মানবাধিকার কমিশন জেলা প্রশাসনের সহায়তায় সরকারি কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে মানবাধিকার সচেতনতা বিষয়ে নিয়মিত মতবিনিময় এবং মানবাধিকার দিবস উদযাপন করে। এসব কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা দল সমাজকর্ম এবং সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতির জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে সহায়তা করতে পারেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক অভিযোগ ও তদন্ত কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা তদন্তকারি দলের সদস্য হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারেন। অন্যদিকে মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক ঘটনার তথ্যাদি কমিশনের নজরে আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যাবলি ও ভূমিকা সম্পর্কে প্রচারে সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করতে পারেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো মানবাধিকার বিষয়ক গবেষণা ও এ্যাডভোকেসী। সমাজকর্মীরা গবেষক হিসেবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মানবাধিকার বিষয়ক গবেষণা পরিচালনায় ভূমিকা পালন করতে পারেন। সমাজকর্ম গবেষণার জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে মানবাধিকার বিষয়ক গবেষণা পরিচালনায় সমাজকর্মীরা কমিশনের কার্যক্রমে সহায়তা করতে পারেন।

এছাড়া সমাজকর্মীরা মানবাধিকার বিষয়ক সেমিনার, ওয়ার্কসপের আয়োজন, মানবাধিকার শিক্ষার প্রচার প্রভৃতি উপায়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে সাহায্য করতে পারে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – বাংলাদেশে সরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

টপিক – ০৮ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১। বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর কখন প্রতিষ্ঠা করা হয়?

ক. ১৯৫৩ সালে খ. ১৯৫৪ সালে গ. ১৯৫৬ সালে ঘ. ১৯৬১ সালে

২। গ্রামীণ সমাজসেবা গৃহীত হয় কত সালে?

ক. ১৯৭১ সালে খ. ১৯৭৩ সালে গ. ১৯৭৪ সালে ঘ. ১৯৭৬ সালে

৩। বাংলাদেশে আধুনিক সমাজকল্যাণের বাস্তব প্রয়োগের সূচনা হয় কীসের মাধ্যমে?

ক. গ্রামীণ সমাজসেবার মাধ্যমে খ. শহর সমাজসেবার মাধ্যমে

গ. চিকিৎসা সমাজকর্মের মাধ্যমে ঘ. জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে

কোনটি গ্রামীণ সমাজসেবার বৈশিষ্ট্য?

ক. পরিবারকে উন্নয়নের একক ধরা খ. গ্রামকে উন্নয়নের একক ধরা

গ. দলকে উন্নয়নের একক ধরা ঘ. সমষ্টিকে উন্নয়নের একক ধরা

৫। করম আলী ভূমিহীন কৃষক। অন্যের জমি আওতায় ঋণগ্রহণ করে। করম আলীর এ ঋণ গ্রহণ কোন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত? বর্গা নিয়ে চাষ করার জন্য সুদমুক্ত ঋণদান কর্মসূচির

ক. সরকারি সমাজসেবা খ. গ্রামীণ সমাজসেবা

গ. শহর সমাজসেবা ঘ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমে সমাজকর্মীর ভূমিকা কী?

ক. মানবাধিকার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

খ. মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

গ. মানবাধিকার বিষয়ক গবেষণা ও এ্যাডভোকেসী

ঘ. উপরের সবগুলোই সঠিক

৭। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ কেন?

i. বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা গ্রামীণ

ii. গ্রামকে কেন্দ্র করেই এদেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠেছে

iii. বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন গ্রামীণ উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i এবং ii　　খ. ii এবং iii　　গ. i এবং iii　　ঘ. i, ii এবং iii

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

করিম সাহেবের ছোট ছেলের বয়স ১৪ বছর। নবম শ্রেণীতে পড়াকালীন সময়ে মহল্লার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নেশার খরচ নির্বাহের জন্য করিম সাহেবের ছেলে ঘরের জিনিসপত্র চুরি করে বিক্রি শুরু করে। করিম সাহেব অনেক চেষ্টা করেও ছেলের আচরণ শুধরাতে ব্যর্থ হন। অবশেষে নিজের সামাজিক মর্যাদা ও ইজ্জতের তোয়াক্কা না করে ছেলেকে পুলিশে সোপর্দ করেন। কিন্তু বয়স কম বলে পুলিশ তাঁর ছেলেকে গ্রহণ না করে বিশেষ প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর পরামর্শ দেন।

৮।অনুচ্ছেদে উপস্থাপিত বিশেষ প্রতিষ্ঠান বলতে বুঝানো হয়েছে-

ক. কিশোরী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান　　খ. কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান

গ. কিশোর হাজত　　ঘ. কিশোর আদালত

৯। জাতীয় সংসদে জাতীয় মানবাধিকার আইন পাস হয় ১৪ জুলাই-

ক. ২০০৭　　খ. ২০০৮　　গ. ২০০৯　　ঘ. ১৯৯৬

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১০। পুলিশ করিম সাহেবের ছেলেকে বিশেষ প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর পরামর্শ দেন। কারণ-

i. অপরাধপ্রবণ শিশুদের সংশোধনের লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত

ii. কঠোর শাস্তি এবং নিয়মানুবর্তিতার বিধান আছে

iii. আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিশোরদের সংশোধনের ব্যবস্থা আছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i এবং ii　　খ. ii এবং iii　　গ. i এবং iii　　ঘ. i, ii এবং iii

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – বাংলাদেশে সরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

টপিক – ০৯ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

১। উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

নারায়নগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলায় যৌতুকের জন্য নাসরিন আক্তার নামের গৃহবধুকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। ঘটনার পর থেকে গৃহবধূর স্বামী, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি পলাতক রয়েছে। গ্রাম বাংলায় নাসরিনের মতো অসংখ্য গৃহবধূ প্রতিদিন যৌতুকের জন্য নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হচ্ছে। মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘনের শিকার অজ্ঞ-অশিক্ষিত জনগণ বছরের পর বছর ধরে মানবেতর জীবনযাপন করে আসছে।

ক. সরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম কাকে বলে?

খ. কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য কী?

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ঘটনার প্রতিকারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কী ভূমিকা পালন করতে পারে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মানবাধিকার সংরক্ষণে সমাজকর্মীর ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

নিচে প্রদত্ত বাংলাদেশে প্রচলিত একটি সমাজসেবা কর্মসূচি সম্পর্কিত ছকটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

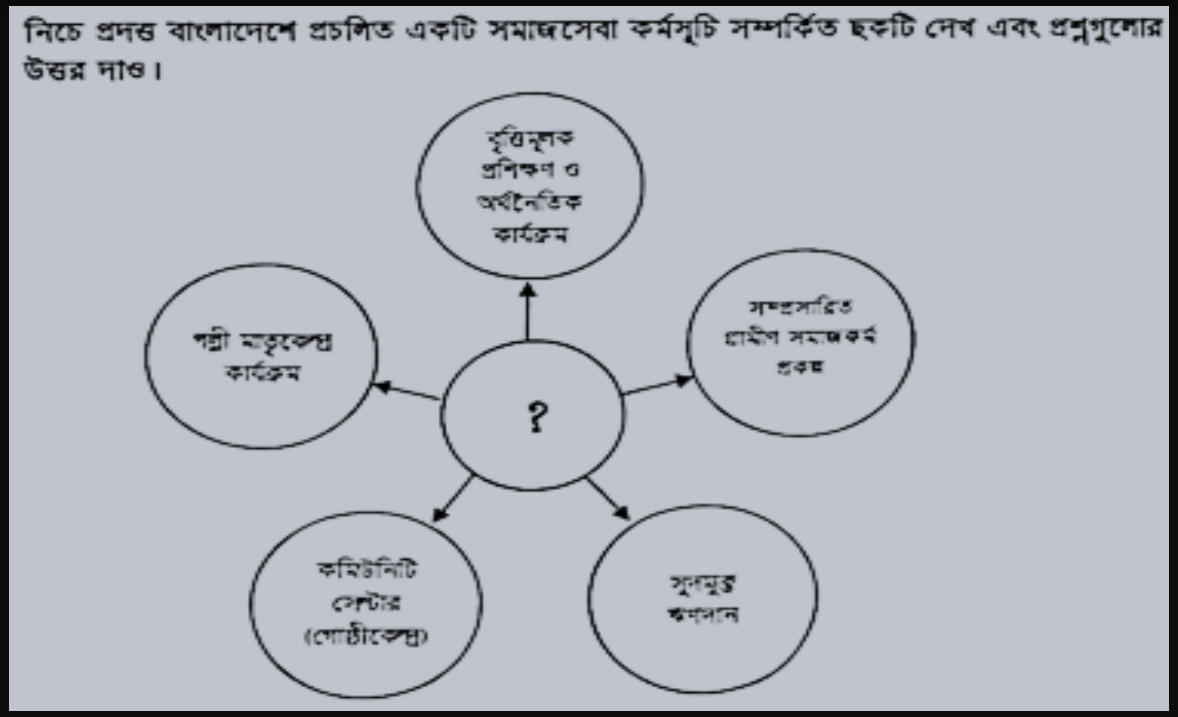

ক. ছকের শূন্যঘরটি পূরণ কর।

খ. সুদমুক্ত ঋণদান কর্মসূচির উদ্দেশ্য কী?

গ. ছকে নির্দেশিত সমাজসেবা কর্মসূচির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

ঘ. 'ক' প্রশ্নের জন্য তোমার দেওয়া উত্তরের যৌক্তিকতা উল্লেখ করে ছকটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

THANK YOU